দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রমিত ভাষায় কথা বলি

১ম পরিচ্ছেদ

ধ্বনির উচ্চারণ

বাংলাদেশের সব অঞ্চলের মানুষের ভাষা এক রকমের নয়। অঞ্চলভেদে অনেক শব্দের উচ্চারণ আলাদা হয়, কখনো কখনো একই অর্থে ভিন্ন ভিন্ন শব্দও ব্যবহার করা হয়। ভাষাগত এই তফাতকে বলা হয় আঞ্চলিক ভাষা। আঞ্চলিক ভাষার কারণে এক অঞ্চলের মানুষের কথা আর এক অঞ্চলের মানুষের বুঝতে সমস্যা হয়। অন্যদিকে প্রমিত ভাষায় কথা বললে সব অঞ্চলের মানুষ সহজে বুঝতে পারে। প্রমিত ভাষাকে মনে করা হয় ভাষার মান রূপ বা আদর্শ রূপ।

প্রমিত ভাষার দুটি রূপ আছে: কথ্য প্রমিত ও লেখ্য প্রমিত। কথ্য প্রমিত ব্যবহার হয় আনুষ্ঠানিক কথা বলার সময়ে, অন্যদিকে লেখ্য প্রমিত ব্যবহার হয় লিখিত যোগাযোগের কাজে।

প্রমিত ভাষার প্রয়োগ

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা অফিস-আদালতে প্রমিত ভাষা ব্যবহার করতে হয়। এছাড়া অনুষ্ঠান সঞ্চালনা, সংবাদ পাঠ, হারানো বিজ্ঞপ্তি প্রচার, যে কোনো ধরনের ঘোষণা, খেলার মাঠের ধারাবিবরণী, শ্রেণিকক্ষে পাঠদান, কোনো বিষয়ে বক্তৃতা বা আলোচনা ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে প্রমিত ভাষায় কথা বলা হয়ে থাকে।

উপরের যে কোনো একটি আনুষ্ঠানিক পরিস্থিতি এককভাবে বা দলে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করো। উপস্থাপন করা হয়ে গেলে কোন কোন শব্দ প্রমিত হয়নি, সে ব্যাপারে সহপাঠীদের মতামত নাও এবং নিচের ছক পূরণ করো।

যে শব্দটি প্রমিত হয়নি	শব্দটির প্রমিত রূপ
পাঠকাটি	পাটকাঠি
গইয়া	পেয়ারা

শব্দ খুঁজি

অনেক শব্দ তোমার চারপাশের মানুষ ভিন্নভাবে উচ্চারণ করে, কিংবা প্রমিত শব্দের বদলে আলাদা শব্দ ব্যবহার করে। তোমার উচ্চারণেও হয়তো এ রকম ব্যাপার ঘটে। প্রথম কলামে এ ধরনের শব্দ এবং দ্বিতীয় কলামে এর প্রমিত রূপ লেখো। শব্দটির উচ্চারণে পরিবর্তন ঘটেছে, না কি শব্দের রূপটিই পরিবর্তিত হয়েছে, তা তৃতীয় কলামে নির্দেশ করো।

আঞ্চলিক উচ্চারণ/শব্দ	প্রমিত শব্দ	উচ্চারণগত/শব্দগত পরিবর্তন
খাইছি	খেয়েছি	উচ্চারণগত পরিবর্তন
চঙ্গা	মই	শব্দগত পরিবর্তন

ঘোষ ও অঘোষ ধ্বনি

আমাদের গলার ভিতরে শ্বাসনালির উপরের অংশে যে পর্দা থাকে, তাকে ধ্বনিদ্বার বা স্বরতন্ত্রী বলে। ফুসফুস থেকে বাতাস বেরিয়ে আসার সময়ে এই ধ্বনিদ্বার কাঁপে। কিছু ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ধ্বনিদ্বার কম কাঁপে, সেগুলোকে বলে অঘোষ ধ্বনি। যেমন: ক খ চ ছ ট ঠ ত থ প ফ। আবার কিছু ধ্বনি উচ্চারণের সময় ধ্বনিদ্বার বেশি কাঁপে, সেগুলোকে বলে ঘোষ ধ্বনি। যেমন: গ ঘ ঙ জ ঝ ঞ ড ঢ ণ দ ধ ন ব ভ ম। ধ্বনিদ্বারের বাইরে থেকে গলায় আলতোভাবে দুটি আঙুল রেখে ধ্বনিগুলো উচ্চারণ করলে ঘোষ ধ্বনি ও অঘোষ ধ্বনির পার্থক্য বুঝতে পারবে।

উচ্চারণ অনুশীলন করার জন্য নিচে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো। ধ্বনির উচ্চারণ যথাযথ রেখে এগুলো জোরে জোরে পড়ো:

কই	খই	গই	ঘই
চই	ছই	জই	ঝই
চাল	ছাল	জাল	ঝাল
টাল	ঠাল	ডাল	ঢাল
টিন	ঠিন	ডিন	ঢিন
তিন	থিন	দিন	ধিন
তুপ	থুপ	দুপ	ধুপ
পুপ	ফুপ	বুপ	ভুপ
কেক	খেক	গেক	ঘেক
পেক	ফেক	বেক	ভেক
ক্যাট	খ্যাট	গ্যাট	ঘ্যাট
ট্যাট	ঠ্যাট	ড্যাট	ঢ্যাট
চোর	ছোর	জোর	ঝোর
তোর	থোর	দোর	ধোর

উচ্চারণ ঠিক রেখে ছড়া পড়ি

এখানে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা একটি কবিতা দেওয়া হলো। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮৮২ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯২২ সালে মারা যান। তাঁকে বলা হয় 'ছন্দের জাদুকর'। 'বেণু ও বীণা', 'ফুলের ফসল', 'কুহু ও কেকা' ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত কবিতার বই। নিচের কবিতাটি কবির 'কুহু ও কেকা' নামের বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

কবিতাটি প্রথমে নীরবে পড়ো; এরপর সরবে পাঠ করো।

ছিন্ন-মুকুল

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

সবচেয়ে যে ছোটো পিঁড়িখানি
সেইখানি আর কেউ রাখে না পেতে,
ছোটো থালায় হয়নাকো ভাত বাড়া,
জল ভরে না ছোট্ট গেলাসেতে;
বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে যে ছোটো
খাবার বেলায় কেউ ডাকে না তাকে,
সবচেয়ে যে শেষে এসেছিল
তারি খাওয়া ঘুচেছে সব আগে।

সবচেয়ে যে অল্পে ছিল খুশি,–
খুশি ছিল ঘেঁষাঘেঁষির ঘরে,
সেই গেছে, হায়, হাওয়ার সঙ্গে মিশে
দিয়ে গেছে জায়গা খালি করে,
ছেড়ে গেছে, পুতুল, পুঁতির মালা,
ছেড়ে গেছে মায়ের কোলের দাবি,
ভয়-তরাসে ছিল যে সবচেয়ে
সেই খুলেছে আঁধার ঘরের চাবি!

সবচেয়ে যে ছোটো কাপড়গুলি
সেগুলি কেউ দেয় না মেলে ছাদে,
যে শয্যাটি সবার চেয়ে ছোটো
আজকে সেটি শূন্য পড়ে কাঁদে;
সবচেয়ে যে শেষে এসেছিল
সেই গিয়েছে সবার আগে সরে,
ছোট্ট যে-জন ছিল রে সবচেয়ে
সেই দিয়েছে সকল শূন্য করে।

শব্দের অর্থ

গেলাস: গ্লাস।

ঘেঁষাঘেঁষির ঘর: একসাথে কয়েক ভাইবোন বড়ো হয় যে বাড়িতে।

ঘোচা: শেষ হওয়া।

তরাস: ত্রাস, ভয়।

পিঁড়ি: বসার ছোটো আসন।

পুঁতির মালা: পুঁতি দিয়ে তৈরি করা মালা।

পেতে রাখা: বসার জন্য মেঝেতে রাখা।

ভাতবাড়া: খাওয়ার জন্য ভাত থালায় রাখা।

শয্যা: শোয়ার বিছানা।

উচ্চারণ ঠিক করি

উচ্চারণের সময়ে অঞ্চলভেদে ঘোষ ধ্বনি অঘোষ ধ্বনিতে পরিণত হতে পারে, কিংবা অঘোষ ধ্বনি ঘোষ ধ্বনিতে পরিণত হতে পারে। আবার, অল্পপ্রাণ ধ্বনি বদলে মহাপ্রাণ ধ্বনি হয়ে যেতে পারে, কিংবা মহাপ্রাণ ধ্বনি বদলে অল্পপ্রাণ ধ্বনি হয়ে যেতে পারে। ষষ্ঠ শ্রেণিতে তোমরা শিখেছ, বাতাস কম-বেশির কারণে ধ্বনি অল্পপ্রাণ বা মহাপ্রাণ হয়। যেমন: ক গ চ জ ট ড ত দ প ব ধ্বনি অল্পপ্রাণ এবং খ ঘ ছ ঝ ঠ ঢ থ ধ ফ ভ ধ্বনি মহাপ্রাণ।

নিচের ছকে 'ছিন্ন মুকুল' কবিতা থেকে কিছু শব্দ দেওয়া হয়েছে। যেসব ধ্বনির উচ্চারণে ঘোষ-অঘোষ কিংবা অল্পপ্রাণ-মহাপ্রাণের পার্থক্য ঘটতে পারে, সেগুলো লাল হরফে দেখানো হলো। তোমার উচ্চারণ ঠিক হলে ডান কলামে টিকচিহ্ন (√) দাও।

শব্দ	অঞ্চলভেদে বর্ণটির উচ্চারণ যা হতে পারে	বর্ণটির প্রমিত উচ্চারণ যা হবে	এখানে কোন ধরনের পরিবর্তন হয়েছে	উচ্চারণ ঠিক হলে টিকচিহ্ন দাও
স**ব**চেয়ে	প	ব	ঘোষ ধ্বনি অঘোষ ধ্বনি হয়েছে	
পিঁড়ি	ফ	প	অল্পপ্রাণ ধ্বনি মহাপ্রাণ ধ্বনি হয়েছে	
ছো**টো**	ড	ট		
পেতে	ফ	প		
ভাত	ব	ভ		
বাড়ি	ভ	ব		
ঘু**চে**ছে	ছ	চ		
পুঁতি	ফ	প		
আঁ**ধা**র	দ	ধ		
ঘর	ঘ	গ		
চাবি	ছ	চ		
ছা**দ**	ত	দ		

২য় পরিচ্ছেদ
শব্দের উচ্চারণ

নিচে একটি গল্প দেওয়া হলো। গল্পের নাম 'কত দিকে কত কারিগর'। এটি সৈয়দ শামসুল হকের (১৯৩৫-২০১৬) লেখা। সৈয়দ শামসুল হক কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও নাটক রচনা করেছেন। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় অবদান রাখার কারণে তাঁকে সব্যসাচী লেখক বলা হয়। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে আছে–'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়', 'নূরলদীনের সারাজীবন' ইত্যাদি। তিনি সিনেমার জন্যও কাহিনি, চিত্রনাট্য, সংলাপ ও গান লিখেছেন।

'কত দিকে কত কারিগর' গল্পটি পড়ার সময়ে প্রমিত উচ্চারণের দিকে খেয়াল রেখো।

কত দিকে কত কারিগর

সৈয়দ শামসুল হক

নদী পার হয়ে, ওপারে কুমোরদের একটা গ্রামের ভেতরে সারাদিন দেখছি ওদের মাটির কাজ। হাঁড়ি পাতিল সরা সানকি তৈরি করছে ওরা। বেশি কৌতূহল নিয়ে দেখেছি পাটার কাজ। মাটির পাটায় ফুলের নকশা, রবীন্দ্রনাথ, বেণীবন্ধনরত যুবতীর চিত্র, জয়নুলের আঁকা গরুর চাকা ঠেলে তোলার প্রতিলিপি, উড়ন্ত পরি, ময়ূরপঙ্খি নৌকার চিত্র, চোখ বুজে নজরুল যে বাঁশি বাজাচ্ছেন, সেই ফটোগ্রাফের নকল। বাঁশবনে আচ্ছন্ন শীতল একটি গ্রামে, অবিশ্বাস্য ঝিম ধরা নীরবতার ভেতরে, সবুজ শ্যাওলা ধরা কুমোরদের প্রাঙ্গণে সার দিয়ে সাজানো রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জয়নুল।

আজকাল এগুলোর বিক্রি ভালো। সস্তায় ঘরের দেয়াল সাজাবার জন্যে অনেকেই কেনে। একেকটা চিত্রের জন্যে কাঠের ওপর খোদাই করা নকশা আছে। তার ওপর কাদার তাল টিপে টিপে পাটা তৈরি করছে ওরা। কাদার তালে ফুটে উঠছে নকশা। বাঁশের কলম দিয়ে সংশোধন করে পাটাগুলো ভাঁটিতে পোড়াবার জন্যে তৈরি করা হচ্ছে।

কাজ করছে যারা তাদের ভেতরে কিশোর বেশ কয়েকজন। যুবক দুজন। আর একপাশে উঁচু পিঁড়ির ওপর উবু হয়ে বসে কাজের তদারক করছেন বৃদ্ধ পালমশাই। মাথায় টাক। কানের দুপাশে সাদা এক খামচা করে চুল। তিনি শ্যেন চোখে কারিগরদের হাতের দিকে তাকিয়ে আছেন।

–এইও। করলি কী! আরে দামড়া!

কারিগর ছোকরা এতগুলো। কাকে দামড়া বলে সম্বোধন করলেন, বুঝতে পারলাম না। কিন্তু বুঝেছে ঠিক যাকে বলা হয়েছে সে। দেখলাম, সে ছোকরা চোখ না তুলেই চট করে একটিপ মাটি নিয়ে ময়ূরপঙ্খি নৌকায় বসা মহারাজ ধরনের মূর্তিটির মুকুটে লাগাল।

পালমশাই আমার দিকে ফিরে হেসে বললেন, নজর না রাখলে কাম সারা। দ্যাখলেন না? চান্দ সওদাগরের মুকুটটা যে ছাঁচে ওঠে নাই, ব্যাটার খ্যাল নাই। বলেই 'উঁহুহু' করেই নিজেই উঠে গেলেন ছোকরার কাছে।

তারপর ছোকরার হাত থেকে বাঁশের চিকন কলমটা খপ করে টেনে নিয়ে মুকুটের ওপর অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে চিকন নকশা এঁকে দিলেন।

–জ্যাঠা।

পেছন থেকে ডাক শুনে বিরক্ত হয়ে ঘুরে তাকালেন পালমশাই।

ব্যাস আর কোনো কথা নয় কারো তরফে। ঘুরে তাকিয়ে তিনিও বুঝতে পারলেন, যে ছোকরা ডাক দিয়েছিল সেও মাথা নিচু করে বসে রইল সমুখের কাঁচা মাটির পাটার দিকে তাকিয়ে।

আরে, দামড়া! রবীন্দ্রনাথের দাড়িতে ঢেউ খেলানো কয়বার দেখাইয়া দিতে অয়? আমার দিকে ফিরে বললেন, বোঝলেন, এই দাড়ি তো বাংলার সক্কলে চেনে। চেনে মানে, ছায়া দেখলেও চেনে। খালি ছায়া দিয়াই বুঝান যায় রবীন্দ্রনাথ। তাইলে বোঝেন, সেই কবির দাড়িই যদি ঠিক না অয়, দাড়ি দেইখা যদি লালন ফকির মনে হয়, কি মাওলানা ভাসানী মনে হয়, তাইলে চলব?

আবার দ্রুত হাত চলে পালমশাইয়ের। মহাবিরক্ত হয়ে তিনি কাঁচামাটির পাটায় রবীন্দ্রনাথের দাড়িতে সূক্ষ্ম আঁচড় কেটে চলেন। আঁচড় কাটতে কাটতে আমাকে বলেন, বোঝলেন, কাঠের ছাঁচে সকল টানটোন ছাপছোপ ঠিক ওঠে না। হাতে ঠিক করতে অয়। নইলে মাল নষ্ট। পয়সা নষ্ট। তার উপর ধরেন, ভাঁটি থিকা বাইর করলেও কিছু বাদ-বাতিল হয়া যায়।

জয়নুলের আঁকা গরুর গাড়ির চাকা ঠেলে তোলার ছবির দিকে দেখিয়ে পালমশাইকে জিগ্যেস করি, এটা কার ছবি?

–ক্যান? মানুষ চাকা ঠেইলা তোলে–সেই ছবি।

–সে কথা নয়। কার আঁকা ছবি?

পালমশাই একটু ইতস্তত করে বললেন, ধরেন, আমাগো আঁকা।

আমি হেসে বললাম, পালমশাই, এটা জয়নুল আবেদীনের আঁকা।

শুনে কিছুক্ষণ ভ্রু কুঁচকে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর নিরাসক্ত গলায় বললেন, হ, হইতে পারে। কেটা জানে! কত দিকে কত কারিগর আছে। জয়নাল না কী কইলেন? নাম মনে থাকে না। তারপর ধরেন গিয়া, আমরা যে আর্টের কাম করি, আমাগো চেনে কয়জন? নাম জানে কয়জন? এই যে আমার বাবায়, তানি ছিলেন এতবড়ো আর্টিস্ট, কে তারে স্মরণ রাখছে কন? তারপর একটু চুপ থেকে বললেন, জয়নাল? হ, হইতে পারে। তয়, এই নকশাটা খুব চলছে।

জিগ্যেস করলাম, আচ্ছা, এটা তো রবীন্দ্রনাথ। ওটা কবি নজরুল–বাঁশি বাজাচ্ছেন।

পালমশাই সন্দিগ্ধ চোখে একবার আমার, একবার পাটা দুটোর দিকে তাকালেন। ভাবলেন, হয়তো চেহারা ঠিক মেলেনি। বললেন, ক্যান, কী হইছে?

–না, ঠিকই আছে। আমি শুধু জানতে চাইছি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ছবি করেন না?

–বঙ্গবন্ধু?

–হ্যাঁ।

–ক্যান, দ্যাহেন নাই–ঐ যে উপরে চাইয়া দেহেন–সবার উপরেই তো বঙ্গবন্ধুর দুইডা ছবি। হেরে তো মধ্যে বা নিচে রাহন যায় না।

এতক্ষণ মুঠোতে ধরে রাখা চশমাটা এবার চোখে দিলাম। সত্যি, বঙ্গবন্ধুকে এই কারিগর স্থান দিয়েছেন সবার ওপরে। চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে এল।

শব্দের অর্থ

অবিশ্বাস্য: যা বিশ্বাস করা যায় না।
আঁচড়: দাগ টানা।
আর্ট: ছবি আঁকা ও অন্যান্য শিল্প।
আর্টিস্ট: শিল্পী।
ইতস্তত: দ্বিধা।
এক খামচা চুল: পাঁচ আঙুলের এক খামচিতে তোলা একমুঠ চুল।
একটিপ: একটুখানি।
কাদার তাল: কাদার পিন্ড।
কারিগর: যাঁরা হাতে জিনিস বানান।
কুমোর: মাটি দিয়ে বিভিন্ন জিনিস বানানো যাঁদের পেশা।
কৌতূহল: অবাক, জিজ্ঞাসা।
খোদাই করা নকশা: কেটে কেটে বানানো নকশা।
চান্দ সওদাগর: বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনির একটি চরিত্র।
ছাঁচ: কোনো কিছু বানানোর কাঠামো।
ছোকরা: ছেলে।
জয়নুল আবেদীন: বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী।
জ্যাঠা: চাচা।
ঝাপসা: অস্বচ্ছ, অস্পষ্ট।
তরফ: পক্ষ।
দামড়া: বলদ গরু।
নিরাসক্ত: আবেগহীন, নির্লিপ্ত।
পাটা: মাটির ফলক।
বাঁশবনে আচ্ছন্ন: বাঁশগাছ দিয়ে ভরা।
বেণীবন্ধনরত: বেণী বাঁধছে এমন।
ভাঁটি: মাটির তৈরি জিনিস পোড়ানোর বড়ো চুলা।
ময়ূরপঙ্খি নৌকা: যে নৌকার সামনের দিকটা ময়ূরের মুখের মতো নকশা করা।
মওলানা ভাসানী: বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত রাজনীতিবিদ।
লালন ফকির: বাংলা ভাষার একজন বিখ্যাত লোককবি ও গায়ক।
শ্যেন: তীক্ষ্ণ, বুনো।
সন্দিগ্ধ: সন্দেহ ভরা।
সমুখের: সামনের।
সরা: মাটির ঢাকনা।
সানকি: মাটির থালা।
সূক্ষ্ম: মিহি, সরু।

শব্দের উচ্চারণ

প্রমিত ভাষায় শব্দের উচ্চারণ ঠিকমতো করতে হয়। ‘কত দিকে কত কারিগর’ গল্প থেকে কিছু শব্দ বাম কলামে দেওয়া হলো। শব্দগুলোর উচ্চারণে অনেক সময় ভুল হয়, সেটি মাঝের কলামে দেখানো হয়েছে। আর প্রমিত উচ্চারণ কেমন হবে, তা ডানের কলামে লিখে দেখানো হয়েছে। তোমার উচ্চারণ এখান থেকে ঠিক করে নাও।

শব্দ	প্রমিত উচ্চারণ নয়	প্রমিত উচ্চারণ
আঁচড়	আছোড়্	আঁচোড়্
আর্টিস্ট	আটিস্ট্	আর্টিস্ট্
ইতস্তত	ইতোস্‌তত্	ইতোস্‌ততো
উঁচু	উচু	উঁচু
এতক্ষণ	এতোক্‌খোন্	অ্যাতোক্‌খোন্
কাঁচা	কান্‌চা	কাঁচা

কাঠ	কাট্	কাঠ্
গ্রাম	গেরাম্	গ্রাম্
ঘুরে	গুরে	ঘুরে
চাকা	ছাকা	চাকা
চিকন	চিকুন্	চিকোন্
চিত্র	চিত্তোরো	চিত্ত্রো
চোখ	চুখ্	চোখ্
জন্যে	জোইন্নে	জোন্নে
জিগ্যেস	জিগেশ্	জিগ্গেশ
ঝাপসা	ঝাফ্শা	ঝাপ্সা
ঠেলা	ট্যালা	ঠ্যালা
তদারক	তধারক্	তদারক্
তরফ	তরোপ্	তরোফ্
দ্রুতগতি	দুর্তোগোতি	দ্রুতোগোতি
নৌকা	নুউকা	নোউকা
পাটা	ফাটা	পাটা
প্রতিলিপি	পোর্তিলিপি	প্রোতিলিপি
প্রাঙ্গণ	পিরাঙ্গোন্	প্রাঙ্গোন্
ফটোগ্রাফ	ফটোগিরাফ্	ফটোগ্রাফ্
বাঁশ	বাশ্	বাঁশ্
বৃদ্ধ	বিরিদ্ধো	বৃদ্ধো
বেণী	ভেনি	বেনি
ভ্রু	ভুরু	ভ্রু
শ্যেন	শেন্নো	শেন্
সন্দিগ্ধ	ছোন্দিগ্ধো	শোন্দিগ্ধো
সম্বোধন	সম্মোধন্	সম্বোধন্
সূক্ষ্ম	শুক্মো	শুক্খোঁ
স্থান	ইস্থান্	স্থান্
স্মরণ	ছরোন্	শঁরোন্
হাঁড়ি	হারি	হাঁড়ি

আঞ্চলিক ভাষা

‘কত দিকে কত কারিগর’ গল্পে পালমশাইয়ের কথায় আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। নিচের ছকের বাঁ কলামে পালমশাইয়ের মুখের বাক্য লেখো, আর ডান কলামে বাক্যগুলোকে প্রমিত ভাষায় রূপান্তর করো। একটি করে দেখানো হয়েছে।

আঞ্চলিক বাক্য	প্রমিত রূপ
ক্যান, কী হইছে?	কেন, কী হয়েছে?

প্রমিত ভাষার চর্চা

আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রগুলোতে আমরা প্রমিত ভাষায় কথা বলব। শ্রেণিতে নিচের বিষয়গুলো নিয়ে প্রমিত ভাষায় কথা বলার অনুশীলন করো।

১. সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপস্থাপনা

২. একুশে ফেব্রুয়ারি, ছাব্বিশে মার্চ, ষোলই ডিসেম্বর বা অন্য কোনো দিবস উপলক্ষে বক্তৃতা

৩. খবর পাঠ

৪. নিজের কোনো অভিজ্ঞতার উপস্থাপন

৫. লাইব্রেরিয়ান, ডাক্তার বা অন্য কোনো লোকের সাথে আলাপ।